রাখালী

জসীম উদ্দীন

সূচিপত্র

কবর 2
জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায় 9
তরুণ কিশোর 12
পল্লী জননী 19
বৈদেশী বন্ধু 23
বৈরাগী আর বোষ্টমী যায় 26
মেনা শেখ 29
রাখাল ছেলে 34
রাখালী 36

কবর

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।
সোনালী ঊষায় সোনামুখে তার আমার নয়ন ভরি,
লাঙ্গল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোর তামাশা করিত শত।

এমন করিয়া জানিনা কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোট-খাট তার হাসি-ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালা এক ছড়া নিতে কখনও হতনা দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ির বাটে !

হেস না–হেস না–শোন দাদু সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশি হোত দেখিতিস যদি চেয়ে।
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, ‘এতদিন পরে এলে,
পথপানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে।’

আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্‌ দাদু, ‘আয় খোদা, দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।’

তার পরে এই শুন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি,
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি
গনিয়া গনিয়া ভুল করে গনি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কতসোনা মুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে লাগায়ে বুক,
আয় আয় দাদু, গলাগলি ধরে কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপ্জী ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই ? কি করিব দাদু, পরান যে মানে না !

সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
বা-জান, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।
ঘরের মেঝেতে সপ্ টি বিছায়ে কহিলাম, বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা–বা-জানেরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দু হাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিন-মান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়ে যেতে গেঁয়ো-পথিকেরা মুছিয়া যাইতো চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।
উদাসিনী সেই পল্লীবালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,

হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বীষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, ‘বাছারে যাই,
বড় ব্যথা রল দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, দাদু রে আমার, লক্ষী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।’
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কি জানি আশিস্ করি গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।

ক্ষণ পরে মোরে ডাকিয়া কহিল, ‘আমার কবর গায়,
স্বামীর মাথার ‘মাথাল’ খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।’
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরানের ব্যথা মরে না কো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়-মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়ে।
জোনাকি মেয়েরা সারা রাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নুপুর কত যেন বেসে ভাল।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু,’রহমান খোদা, আয়,
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়ে।’

এইখানে তোর বু-জীর কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজীদের ঘরে বনিয়াদী ঘর পেয়ে।

এত আদরের বু-জীরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে।
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, ‘দাদু যেন কাল এসে,
দু দিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।
শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে, ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিত ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরানে বাজিবে মরণ-বীণ!
কি জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়াছি দেখে যাও দাদু ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেউ ভাল,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু,’আয় খোদা দয়াময়!।
আমার বু-জীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়।’

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু সাত বছরের মেয়ে,

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা।
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদীর মুখখানি মোর হৃদয়ে উঠিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে,
কি জেনি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হসেতে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি–
দাদু ধর–ধর–বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।
এইখানে এই কবরের পাশে, আরও কাছে আয় দাদু,
কথা ক'সনাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুড়ে দেখ্ দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীন দুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে।

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
এমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।

মজীদ হইছে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দুর!
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর্, ‘আয় খোদা, রহমান,
ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ!’

জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়

জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়,
পদ্মা নদীর উজান বাঁকে ছোট্ট ডিঙি নায়।
পদ্মা নদী কাটাল ভারী, চাক্কুতে যায় কাটা,
তারির পরে জেলের তরী করে উজান+ভাঁটা।
জলের উপর শ্যাওলা ভাসে, স্রোতের ফুলও ভাসে,
তারির পরে জেলের তরী ফুলেল পালে হাসে;
তারি সাথে ভাসায় জেলে ভাটীর সুরে গান,
জেলেনী তার হয়ত তাহার সাথেই ভেসে যান।

জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়,
জেলেনী বউ জাল যে বুনায় বসে ঘরের ছায়।
সূতোর পরে সুতো দিয়ে বুনোয় দীঘল জাল,
তারির সাথে বুনিয়ে চলে দীঘল মনের হাল।
জেলে তাহার নেই যে ঘরে, ভোরের কোকিল ডাকে
জেলেনী বউ আপন মনে জাল বুনাতেই থাকে।

জেলে গেছে মাছ ধরিতে হায়,
পূব কোণেতে মেঘের গায়ে চক্কর দিয়ে যায়।
বাও ডাকিল, ঢেউঁ হাঁকিল তল তলা নাওখানি,

জেলেনী বউ ঘরের থেকে সেঁচছে তাহার পানি।
বৈষম শাপট! জেলের কুঁড়ে ভাঙবে যে এই বেলা
গাঙের থেকে দিচ্ছে জেলে বৈঠাতে তার পেলা।

গাঙে কাঁপে জেলের তরী, ঘরে জেলের প্রিয়া,
মধ্যে তারি আসন-যাওন করছে জেলের হিয়া।
জেলে ভাবে ঘরের কথা, বউ যে জেলের তরী,
এরি মধ্যে ঝড় পাগেলা কোথায় যে যায় সরি।
লাভের মাঝে হাজরা তলা দুগ্ধেতে যায় ভাসি,
গঙ্গা দেবীর কপাল ভালো পূজায় উঠেন হাসি!

জেলে গেছে মাছ ধরিতে বাঁকে,
জেলেনী বোর মন ভালো না বলতে নারে কাকে!
জাল বুনিতে ভুল হয়ে যায়, সূতো কেবল ছেঁড়ে
জেলে বাঁকের বগীলা তার মন নিয়েছে কেড়ে।
জলের ঘাটে কলস তাহার ভরেও নাহি ভরে,
ইচ্ছা করে কলসীটিরে বাঁধি মাথার কেশে,
ভাসিয়ে দেয় জেলে তাহার রয় যে বে গান দেশে।

জেলে বাঁকে মাছ ধরিতে যায়,
কূল হারা সেই গাঙে কাহার কুল লইয়া হায়!

অথই নদীর অথই পানি জালে না পায় তাল
অথই মনের ব্যথা জেলের তার চেয়ে জঞ্জাল।
কত নদী পেরিয়ে এলো ততই নদী ছাড়ি,
ব্যথার নদী উথল পাথল জমছেনাক পাড়ি।
মাটির মায়া কাটালো যে ভাটীর সুরে হায়,
কেন তাহার পরাণ টানে সুদূর ভাটী গাঁয়!

তরুণ কিশোর

তরুণ কিশোর ! তোমার জীবনে সবে এ ভোরের বেলা,
ভোরের বাতাস ভোরের কুসুমে জুড়েছে রঙের খেলা।
রঙের কুহেলী তলে,
তোমার জীবন ঊষার আকাশে শিশু রবি সম জ্বলে।
এখনো পাখিরা উঠেনি জাগিয়া, শিশির রয়েছে ঘুমে,
কলঙ্কী চাঁদ পশ্চিমে হেলি কৌমুদী-লতা চুমে।
বঁধুর কোলেতে বধুয়া ঘুমায়, খোলেনি বাহুর বাঁধ,
দীঘির জলেতে নাহিয়া নাহিয়া মেটেনি তারার সাধ।
এখনো আসেনি অলি,
মধুর লোভেতে কোমল কুসুম দুপায়েতে দলি দলি।
এখনো গোপন আঁধারের তলে আলোকের শতদল,
মেঘে মেঘে লেগে বরণে বরণে করিতেছে টলমল।
এখনো বসিয়া সেঁউতীর মালা গাঁথিছে ভোরের তারা,
ঊষার রঙিন শাড়ীখানি তার বুনান হয়নি সারা।
হায়রে করুণ হায়,
এখনি যে সবে জাগিয়া উঠিবে প্রভাতের কিনারায়।
এখন হইবে লোক জানাজানি, মুখ চেনাচেনি আর,
হিসাব নিকাশ হইবে এখন কতটুকু আছে কার।
বিহগ ছাড়িয়া ভোরের ভজন আহারের সন্ধানে,

বাতাসে বাঁধিয়া পাখা-সেতু-বাঁধ ছুটিবে সুদুর-পানে।
শূন্য হাওয়ার শূন্য ভরিতে বুকখানি করি শুনো,
ফুলের দেউল হবে না উজাড় আজিকে প্রভাতে পুন।

তরুণ কিশোর ছেলে,
আমরা আজিকে ভাবিয়া না পাই তুমি হেথা কেন এলে?
তুমি ভাই সেই ব্রজের রাখাল, পাতার মুকুট পরি,
তোমাদের রাজা আজো নাকি খেলে গেঁয়ো মাঠখানি ভরি।
আজো নাকি সেই বাঁশীর রাজাটি তমাল-লতার ফাঁদে,
চরণ জড়ায়ে নূপুর হারায়ে পথের ধূলায় কাঁদে
কে এলে তবে ভাই,
সোনার গোকুল আঁধার করিয়া এই মথুরার ঠাই।

হেথা যৌবন মেলিয়া ধরিয়া জমা-খরচের খাতা,
লাভ লেকাসান নিতেছে বুঝিয়া খুলিয়া পাতায় পাতা।
ওপারে কিশোর, এপারে যুবক, রাজার দেউল বাড়ি,
পাষাণের দেশে কেন এলে ভাই। রাখালের দেশ ছাড়ি?
তুমি যে কিশোর তোমার দেশেতে হিসাব নিকাশ নাই,
যে আসে নিকটে তাহারেই লও আপন বলিয়া তাই।
আজিও নিজেরে বিকাইতে পার ফুলের মালার দামে,
রূপকথা শুনি তোমাদের দেশে রূপকথা-দেয়া নামে।

আজো কানে গোঁজ শিরীষ কুসুম কিংশুক-মঞ্জরী,
অলকে বাঁধিয়া পাটল ফুলেতে ভরে লও উত্তরী!
আজিও চেননি সোনার আদর, চেননি মুক্তাহার,
হাসি মুখে তাই সোনা ঝরে পড়ে তোমাদের যারতার।
সখালী পাতাও সখাদের সাথে, বিনামূলে দাও প্রাণ,
এপারে মোদের মথুরার মত নাই দান-প্রতিদান।
হেথা যৌবন যত কিছু এর খাতায় লিখিয়া লয়,
পান হতে চুন খসেনাক-এমনি হিসাবময়।
হাসিটি হেথায় বাজারে বিকায় গানের বেসাত করি,
হেথাকার লোক সুরের পরাণ ধরে মানে লয় ভরি।
হায়রে কিশোর হায়!
ফুলের পরাণ বিকাতে এসেছ এই পাপ-মথুরায়

কালিন্দী লতা গলায় জড়ায়ে সোনার গোকুল কাঁদে
ব্রজের দুলাল বাঁধা নাহি পড়ে যেন মথুরার ফাঁদে।
মাধবীলতার দোলনা বাঁধিয়া কদম্ব-শাখে শাখে,
কিশোর! তোমার কিশোর সখারা তোমারে যে ওই ডাকে।
ডাকে কেয়াবনে ফুল-মঞ্জরি ঘন-দেয়া সম্পাতে,
মাটির বুকেতে তমাল তাহার ফুল-বাহুখানি পাতে।

ঘরে ফিরে যাও সোনার কিশোর! এ পাপমথুরাপুরী,

তোমার সোনার অঙ্গেতে দেবে বিষবান ছুঁড়ি ছুঁড়ি।
তোমার গোকুল আজো শেখে নাই ভালবাসা বলে কারে,
ভালবেসে তাই বুকে বেঁধে লয় আদরিয়া যারে তারে।
সেথায় তোমার কিশোরী বধূটি মাটির প্রদীপ ধরি,
তুলসীর মূলে প্রণাম যে আঁকে হয়ত তোমারে স্মরি।
হয়ত তাহাও জানে না সে মেয়ে জানে না কুসুম-হার,
এত যে আদরে গাঁথিছে সে তাহা গলায় দোলাবে কার?
তুমিও হয়ত জান না কিশোর, সেই কিশোরীর লাগি,
মনে মনে কত দেউল গেঁথেছে কত না রজনী জাগি।
হয়ত তাহারি অলকে বাঁধিতে মাঠের কুসুম ফুল,
কতদূর পথ ঘুরিয়া মরিছ কত পথ করি ভুল।
কারে ভালবাস, কারে যে বাস না তোমরা শেখনি তাহা,
আমাদের মত কামনার ফাঁদে চেননি উহু ও আহা!
মোদের মথুরা টরমল করে পাপ-লালসার ভারে,
ভোগের সমিধ জ্বালিয়া আমরা পুড়িতেছি বারে বারে।
তোমাদের প্রেম নিকষিত হেম কামনা নাহিক তায়
যুগে যুগে কবি গড়িয়াছে ছবি কত ব্রজের গাঁয়!
তোমাদের সেই ব্রজের ধূলায় প্রেমের বেলাতি হয়,
সেথা কেউ তার মূল্য জানে না, এই বড় বিস্ময়।
সেই ব্রজধূলি আজো ত মুছেনি তোমার সোনার গায়,
কেন তবে ভাই, চরণ বাড়ালে যৌবন মথুরায়!

হায়রে প্রলাপী কবি!
কেউ কভু পারে মুছিয়া লইতে ললাটেরলেখা সবি।
মথুরার রাজা টানিছে যে ভাই! কালের রজ্জু ধরে,
তরুণ কিশোর! কেউ পারিবে না ধরিয়া রাখিতে তোরে।
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
নীল নয়নেতে তোর ব্যথা বুঝি বয়ে যায় অবিরল।
তবু যে তোমারে যেতে হবে ভাই, সে পাষাণ মথুরায়,
ফুলের বসতি ভাঙিয়া এখন যাইবি ফলের গাঁয়।
এমনি করিয়া ভাঙা বরষায় ফুলের ভূষণ খুলি,
কদম্ব-বধূ শিহরীয়া উঠে শরৎ হাওয়ায় দুলি।
এমনি করিয়া ভোরের শিশির ফুরায় ভোরের ঘাসে,
মাধবী হারায় বুকের সুরভি নিদাঘের নিশ্বাস।
তোরে যেতে হবে চলে
এই গোকুলের ফুলের বাঁধন দুপায়েতে দলে দলে।
তবু ফিরে চাও সোনার কিশোর বিদায় পথের ধার,
কি ভূষণ তুমি ফেলে গেলে ব্রজে দেখে লই একবার।
ওই সোনামুখে আজো লেগে আছে জননীর শত চুমো,
দুটি কালো আঁখি আজো হতে পারে ঘুম-গানে ঘুম্ ঘুমো।
বরণ তাদের আর পেলবতা লিখে গেছে নির্ভূল।
কচি শিশু লয়ে ধরার মায়েরা যে আদর করিয়াছে,

সোনা ভাইদের সোনা মুখে বোন যত চুমা রাখিয়াছে;
সে সব আজিকে তোর ওই দেহে করিতেছে টলমল,
নিখিল নারীর স্নেহের সলিলে তুই শিশু শতদল।
রে কিশোর! এই মথুরার পথে সহসা দেখিয়া তোরে,
মনে হয় যেন ওমনি কাহারে দেখেছিনু এক ভোরে।
সে আমার এই কৈশোর-হিয়া, জীবনের একতীরে,
কোথা হতে যেন সোনার পাখিটি উড়ে এসেছিল ধীরে।
পাখায় তাহার বেঁধে এনেছিল দূর গগনের লেখা,
আর এনেছিল রঙিন ঊষার একটু সিঁদুর-রেখা।
সে পাখি কখন উড়িয়া গিয়াছে মোর বালুচর ছাড়ি,
আজিও তাহারে ডাকিয়া ডাকিয়া শূন্যে দুহাত নাড়ি।

সোনার কিশোর ভাই,
তোর মুখ হেরী মনে হয় যেন কোথায় ভাসিয়া যাই।
এত কাছে তুই, তবু মনে হয় আমাদের গেঁয়ো নদী,
রোদ-মাখা সাদা বালু-চরখানি শুকাইছে নিরবধি;
সেইখানে তুই দুটি রাঙা পায়ে আঁকিয়া পায়ের রেখা,
চলেছিস একা বালুকার বুকে পড়িয়া ঢেউএর লেখা।
সে চরে এখনো মাঠের কৃষাণ বাঁধে নাই ছোট ঘর,
কৃষাণের বউ জাঙলা বাঁধেনি তাহার বুকের পর।
লাঙল সেথায় মাটিরে ফুঁড়িয়া গাহেনি ধানের গান,

জলের উপর ভাসিতেছে যেন মাটির ও মেটো-থান।
বর্ষার নদী এঁকেছিল বুকে ঢেউ দিয়ে আলপনা,
বর্ষা গিয়াছে, ওই বালুচর আজো তাহা মুছিল না।
সেইখান দিয়ে চলেজ উধাও, চখা-চখি উড়ে আগ,
কোমল পাখার বাতাস তোমার কমল মুখেতে লাগে।

এপারে মোদের ভরের‘গেরাম’আমরা দোকানদার,
বাটখারা লয়ে মাপিতে শিখেছি কতটা ওজন কার।
তবুরে কিশোর, ওই পারে যবে ফিরাই নয়নখানি,
এই কালো চোখে আজো এঁকে যায় অমরার হাতছানি।
ওপারেতে চর এ পারেতে ভর মাঝে বহে গেঁয়ো নদী।
কিশোর কুমার, দেখিতাম তোরে ফিরিয়া দাঁড়াতি যদি।
তোর সোনা মুখে উড়িতেছে আজো নতুন চরের বালি,
রাঙা দুটি পাও চলিয়া চলিয়া রাঙা ছবি আঁকে খালি।
তুই আমাদের নদীটির মত দুপারে দুইটি তট,
দুই মেয়ে যেন দুইধারে টানে বুড়াতে কাঁখের ঘট।
ওপারে ডাকিছে নয়া বালুচর কিশোর কালের সাথী,
এপারেতে ভর ভরা যৌবন কামনা-ব্যথায় ব্যথী।
তুই হেথা ভাই ঘুমাইয়া থাক গেঁয়ো নদীটির মত,
এপার ওপার দুটি পাও ধরে কাঁদুক বাসনা যত।

পল্লী জননী

রাত থম থম স্তব্ধ, ঘোর-ঘোর-আন্ধার,
নিশ্বাস ফেলি, তাও শোনা যায়, নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বিসয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।

ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁদো ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ?
ছোট কুঁড়ে ঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।

ছেলে কয়, “মারে, কত রাত আছে? কখন সকাল হবে,
ভাল যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে?”
মা কয়“বাছারে ! চুপটি করিয়া ঘুমা ত একটি বার, ”
ছেলে রেগে কয় “ঘুম যে আসে না কি করিব আমি তার ?”
পান্ডুর গালে চুমো খায় মাতা, সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,

ছেলেরে তাহার ভাল কোরে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভাল করে দাও আল্লা রছুল। ভাল কোরে দাও পীর।
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।

বাঁশবনে বসি ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি,
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি।
চলে বুনোপথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি,
দুর ছাই। কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
বালাই, বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ছেলে কয়, “মাগো! পায়ে পড়ি বলো ভাল যদি হই কাল,
করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে না ত তুমি গাল?
আচ্ছা মা বলো, এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া
এখনি আমারে এত রোগ হোতে করিতে পারি ত খাড়া ?”
মা কেবল বসি রুগ্ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে,
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।

“শোন মা! আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ঢ্যাঁপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরি শিকা পরে।
খেজুরে-গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে,
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।”

ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোয় থম থম কাল রাত।

রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়াছিল দুর বনে।
সাঁঝ হোয়ে গেল আসেনাকো আই-ঢাই মার প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,
ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি-সাঁঝে?

কত কথা আজ মনে পড়ে মার, গরীবের ঘর তার,
ছোট খাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই,
বলেছে আমরা মুসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম যে গেল? রহিম চলিল? এমনি প্রশ্ন-মালা;
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।

ঘরের চালেতে ভুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দুত এল বুঝি হায়। হাঁকে মায়, দুর-দুর।

পচা ডোবা হতে বিরহিনী ডা'ক ডাকিতেছে ঝুরি ঝুরি,
কৃষাণ ছেলেরা কালকে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল গড়াইছে তার সনে।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা।
সম্মুখে তার ঘোর কুজঝটি মহা-কাল-রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেলা,
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

বৈদেশী বন্ধু

গান-বারমাসির সুর

যাওরে বৈদেশী বন্ধু যাও হাপন ঘরে,
অভাগী অবলার কথা রাইখ মনে করে।
তোমার দেশেতে বন্ধু। ফুটবে কদম কলি,
আমার দেশে কাজল্যা মেঘা নামবে ঢলি ঢলি।
সেই না কাজলা মেঘা ঝরে রয়া রয়া,
বিজলীর আগুন তাতে পড়ে খয়া খয়া।
সেই আগুন-লাগিবো আমার বুকের বসনে,
সেই আগুন লাগিবো আমার বে-ঘুম শয়নে।

আপন দেশে যাওরে বন্ধু। আপনার ঘর,
দেখিবা আপন জন পরবাস-অন্তর।
মায়েতে মুছাবে মুখ বুকের বসন দিয়া,
বইনে ত করবো বাতাস আবের পাঙ্খা দিয়া।
মায়ে না বসায়া তোমায় কোলের উপর,
নিরালে জিগাইব কত পরবাসের খবর।
মায়ের না আগেরে বন্ধু, বইনের না আগে,
কইও এ অভাগীর কথা যদি মনে লাগে।

মা বুনের আদরে বন্ধু থাকবা যখন ঘরে
অভাগী অবলার কথা দেইখ মনে করে।
ভাবিও তোমার মায়ে যে যত্তন করে,
তেমনি যত্তন কান্দে বৈদেশ নগরে।
হাপনার ভাইএ বইনে যে আদর করে,
তেমনি আদর আছে বেগানারও ঘরে।
ঘরেতে আছে তোমার ধর্ম সোদ্দের বোন,
তোমার উপর দাবী তাহার জানে সর্বজন।
মায়েরও আছে দাবী, বুকের দুধ দিয়া,
তোমারে মানুষ করল কত না করিয়া।
আমি যে বেগানা নারী কোন দাবী নাই,
সেই দুঃখে মরিরে, বন্ধু !কুল নাহি পাই।

বৈদেশী পৈড়াত !তুমি টাকায় খাটো জন,
তারে আজ কি দাম দিলা যার নিলা মন।
আমার দেশে ধান কাটিতে মন কাটিয়া গেলে,
ধানের দামই নিয়ে গেলে মনের দামটা ফেলে।
সেই না ধানের খেতে আবার ঐব ধান,
শাঙইনা পনিতে ভাসপো কাজইলা আসমান
আমার মনেতে বন্ধু। শুধুই চত্রিক মাস,

দুপুইয়া আসমান ছাড়ে আগুনীর শ্বাস।
সেই না আসমানের তলে বাজ ডাকে রয়া,
কেমন গোঁয়াইব কাল মোরে যাও কয়া।

বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়

কোথা হতে এলো রসের বৈরাগী আর বোষ্টমী,
আকাশ হতে নামল কি চান হাসলাপরা অষ্টমী।
চেকন চোকন বোষ্টমী তার ঝটরা মাথায় দীঘল কেশ,
খেজুর গাছের বাগড়া যেমন পূব হাওয়াতে দুলছে বেশ।
পাছা পেড়ে শাড়িখানি পাছা বেয়ে যায় পড়ে,
বৈরাগী কয়, তারির সাথে ফাঁস লাগায় যাই মরে।
মুখখানি তার ডাগর ডোগর ঘষামাজা কলসখানি।
বৈরাগী কয় গলায় বেঁধে মাপতে পারি গাঙের পানি।

সঙ্গে চলে বৈরাগী তার তেল কুচ কুচ নধর কায়,
গয়লা বাড়ির ময়লা বাছুর রোদ মেখেছ সকল গায়।
আকাশেরও কালো মেঘে প্রভাতেরি পড়ছে আলো,
সামনে লয়ে পূর্ণিমা চাঁদ অমাবস্যা যায় কি ভাল।
হাতে তাহার ঘুব ঘুমা ঘুম বাজে রসের একতারা,
বৈরাগী বউর রূপের গাঙ্গে মুর্চ্ছি সে সুর হয় হারা।
বৈরাগী যে চলছে পথে চলছে রসের রূপখানি,
বৈরাগী তার একতারাতে চলছে তারি সুর হানি।

হিসেব লেখে বেনের ছেলে অঙ্কে তাহার হয় যে ভুল,

নুন মাপিতে চুন মেপে কয় বৈরাগিনীর হয় না তুল।
বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়-মহাজনের থামছে খাতা,
থামছে পালা থামছে পাথর, ওরা দুজন নয়কো যা-তা।

সিকে কড়ায় পোয়া কড়ায় ছিল যেথায় হিসাব নিকাশ,
একতারারি ঝঙ্কারেতে আনল সেথার কি অবকাশ।
কৃষ্ণশোকে রাই মরিল, তমাল লতা মুরছে পড়ে,
সাজী মশায় বান ডাকালমহাজনী খাতার পরে।
চলতে পথে সবার ঘরে হুকোর মাথায় আগুন জ্বলে।
বৈরাগী ভাই! বসো বসো তামাক খেয়েই যেয়ো চলে।
চলতে পথে বাটায় বাটায় পান ভরা হয় সবার ঘরে,
বউরা বলে, বোষ্টমী সই পান সেজেছি তোমার তরে।

বৈরাগী আর বোষ্টমী যায়, রবিবারের দিনটি নাকি
একতারারি ঝঙ্কারেতে গায়ের পথে যায় গো ডাকি।
ঘুব ঘুমা ঘুম বাজনা বাজে অবসরের ঘন্টাখানি,
পথের মাঝে যেইবা শুনে অমনি ছাড়ে কাজের ঘানি।
গাঁয়ের ধারে বটের তলে বৈরাগী আর বোষ্টমী গায়,
একতারারি তারে তারে সুরের পরে সুর মূরছায়।
ঘাসের বোঝা ফেলছে চাষী হালের গরু বেপথ যায়,
মান সায়রের কলমিনী শাম-সায়রো ভাসছে হায়।

যাক গরু আজ পরের ক্ষেতে, ধান নিড়ান থাক না ভাই,
শ্যাম গেছে আজ ব্রজ ছেড়ে কেমন করে বাঁচবে রাই?

গান গেয়ে যে বৈরাগী যায় গাঁয়ের পথে অনেক দূর,
মাঠের কাজে কৃষাণ ছেলের বুকের মাঝে কানছে সুর।
গানে গানে দেখছে যেন দুধারে ধান সবুজ সাচা,
মাঝ দিয়ে যায় বৈরাগিনী মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মেনা শেখ

মেনা শেখের খবর জান?-সাত গাঁয়ে তার নাম,
ছেলে বুড়ো যাকেই শুধাও, কোন খানে তার ধাম?
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আলীপুরের মোড়ে,
আকাশ ছোঁয়া খড়ের পালা চোখের পাতা পড়ে।
দুপুর রোদে ধাঁধিয়ে দেওয়া টিনের ঘরের চাল,
গগন-গাঙে উড়ছে যেন সাদা পাখির পাল।
সাত গাঁর লোক গর্ব করে ফুলিয়ে বুকের ছাতা,
মেনা শেখের গাঁয়ের মানুষ নইক মোরা যাতা।

জানিসনে ভাই! সেবার যে ওই দিগ-নগরের হাট।
দবির ছেলে শোকের মামুদ কিনতে গিয়ে পাট।
বরই ডাঙার সাদের সাথে লাগল মারামারি,
মেনা শেখের নাম শুনে সব তুলেই পালা দাড়ি,
-দে ছুট সেই বন-বাদাড়ে যেথায় চলে পাও,
একলা মেনা হারিয়ে দিল একশ জনা সাও।
কথা যাদের টাকায় বিকায় সেই যে উকিল বাবু।
মেনা শেখের রাখতে খাতির সে-ও হয়ে যায় কাবু,
সদর থানার বড় বাবু-যম কাঁপে যার ডরে,
শালার চেয়ে ইতরামি গাল মুখে সদাই ঝরে।

তারেও মেনা-কান-কথাতে করতে পারে গুণ।
মনে নেই সেই দবির জোলার পুতের বৌ-এর খুন?

লেখা পড়া জানে না সে? সিটকিও না দাঁত ;
না পড়েছে আজি ক খ দুখান কলার পাত।
পড়েছে ত সাতটি গাঁয়ের সাতশ বাড়ির লোক,
কেমন করে ব্যথায়-গানে লয়ে হাজার শোক।
মেঠো মায়ের অবোধ ছেলে মাটির সাথে মিশে,
কোলখানি তার সোনায় সাজায় সোনা ধানের শীষে।
সে ত জানে সাত ঋতুতে সাতটি রঙের আলা,
ছবির পরে ছবি এঁকে সাজায় মাঠের থালা।
তারি সাথে হাজার চাষীর কি কাজ হবে রোজ,
কোন মাঠে কে করবে বা কি-জানে সে তার খোঁজ।
বানে ফসল ডোবার আগে ডোবে তাহার চোখ,
মায়ের ছেলে মরার আগে তাহার বুকে শোক।
বিয়ের বেলায় কলমা পড়ায়, মরলে সে দ্যায় গোর
সুখের বেলা সাথের সাথী, দুখীর দুখে ভোর।
কেতাব পড়ে পায়নি খেতাব ? পেয়েছে এক ডাকে,
হাজার চাষীর হাজার লাঠি উঠবস তার হাঁকে।

তোমরা বল অত্যাচারী ?-জিভ কাটিব চুপ করে থাক,

শেখের পোরে ডাক দিয়ে তোর পিঠেতে নয় পিটাব ঢাক।
দোষে গুণে পয়দা মানুষ চাঁদের বুকে রয়েছে দাগ,
যেই মেঘেতে বর্ষে বাদল সেই মেঘেতেই ঝড়েরি রাগ।
মানি আমি, আছে তাহার অনেক রকম অত্যাচারও,
তবু সে কেন মোড়ল মোদের ভেবেছ কি কেউ একবারও?
খুন করিলে বুক দিয়ে সে আগে দাঁড়ায় খুনীর হয়ে,
চোর-ধরিবাজ সবার কুনাম লয় সে আপন মাথায় বয়ে।

একটি ভিটেয় চরছে ঘুঘু তাহার নাকি অত্যাচারে।
জানি আমি কলম-পেষা। এই নিয়ে আজ দুষছ তারে।
হাজার ভিটের চরত ঘুঘু সে না থাকলে মোদের গাঁয়ে,
হাজার চালের খসত ছানি তোমাদের ওই কলম ঘায়ে।
লাঠি তাহার মারে যদি মাথায় তাহা বইতে পারি।
কলম দিয়ে যে মার মারো ব্যথা তাহার বুঝতে নারি।
লাঠির আঘাত সারবে জানি দুদিন কিবা ছদিন পরে,
কলম দিয়ে কর আঘাত সারবে না সে গেলেও গোরে।
জানিনে ওই ছাতার কলম কি দিয়ে বা লও গড়িয়ে,
খোদার কলম রদ করেছো ওরই একটা আঁচড় দিয়ে।
মাঠে মাঠে জমি মোদের খোদ জমিদার খোদার লেখায়,
আলের পরে আল গাঁথিয়া সীমানা তার যায় দেখা যায়।
তোমরা লেখ কাগজে আল, সীমানা তার বুঝতে নারি।

খোদার দেওয়া খাস মহালের তারি মায়ায় দখল ছাড়ি।
সেই কলমের খোরাক দিতে মাঠে মাঠে লাঙল ঠেলি,
মাটি খুঁড়ে যে সোনা পাই চরণতলে দেই যে মেলি।
তবু তাহার মেটে না ভুখ ইচ্ছে করে দনে- পিষে
কলমগুলো দিই জ্বালিয়ে জাহান্নামের আগুন শীষে।

আমরা মাঠের মুক্ত শিশু ভয় করি না ঝঞ্ঝা বাদল,
জাহান্নামের মতন জ্বালা চৈত্র রোদে বাজাই লাঙল।
শুনো মাঠও মন্ত্র শুনে দোলায় তরুণ তৃণের আঁচল,
কচি গায়ে পুলক দিতে কাজলী মেঘও হয়রে সজল।
বর্ষা বুকে ভাসাই মোরা সবুজ ধানের মাদুরখানি,
ছল ছল জলের উপর অন্ন মায়ের আসন টানি।

বাঁশীর সুরে শরৎ-চাঁদের কুচি কুচি সোনার হাসি,
কাঁচা ধানের পাতায় পাতায় মেলতে পারি রাশি রাশি।
মাঠে যে ধান ধরেই নাক, পারি সে ধান ভরতে ডোলে,
এটা কেবল জানিনে ওই কলম ধরে সে কোন কলে।
ঝড় এসে ঘর উড়িয়ে নিলে ঝড়েই ঘরে দেই যে ছানি,
ভয় করিনে বৃষ্টি শীলা- শীরালীদের মন্ত্র জানি।
ভয় করিনে হাঙর কুমীর- দেবতা আছেন খোয়াজ খিজির,
বনের বাঘে ভয় করিনে গাজী মাদার হাঁকছে জিকির।

ভয় শুধু ওই কলমটারে, আঘাত তাহার গায় না লাগে,
শেলের মত বক্ষখানির ব্যথার জাগায় ভীষণ দাগে।
মেনা শেখের হাতের লাঠি ভাঙতে পারে সবার মাথা,
কি দিয়ে ওই গড়ছ কলম, হাজার মারে ভাঙে না তা।

রাখাল ছেলে

“রাখাল ছেলে ! রাখাল ছেলে ! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?”

ওই যে দেখ নীল-নোয়ান সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর রঙে নাওয়া,
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা-
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না।”

“রাখাল ছেলে ! রাখাল ছেলে ! আবার কোথা ধাও,
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।”

“ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতো খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা,
বলছে ডেকে, ‘গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা।’

সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে ভাই।
সাঁঝের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই।’

“রাখাল ছেলে ! রাখাল ছেলে ! সারাটা দিন খেলা,
এ যে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।”

কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী।
রিষে বালা নুইয়ে গলা হলদে হওয়ার সুখে।
টির বোনের ঘোমটা খুলে চুমু দিয়ে যায় মুখে।
ঝাউয়ের ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ-পাগল বুড়ী,
আমরা সেথা চষতে লাঙল মুশীদা-গান জুড়ি।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা-লাঙল-চষা,
সারাটা দিন খেলতে জানি, জানিই নেক বসা’।

রাখালী

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রানতে বসে জল আনতে সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
সান করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোনমতেই থামতে নারে।

এই মেয়েটি এমনি ছিল, যাহার সাথেই হত দেখা,
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা
মা বলিত, বড়ুরে তুই, মিছেমিছি হাসিস্ বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড়!
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার, না সে আবীর,
না সে ঈষৎ ঊষার ঠোঁটে আধ-আলো রঙিন রবির!
কেমন যেন গাল দুখানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে ফোটা কলমি ফুলে কতকটা তার খেলে বাহার।

গালটি তাহার এমন পাতল ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে
দু একটি চুল এলিয়ে পড়ে মাথার সাথে রাখছে ধরে।
সাঁঝ-সকালে এ ঘর ও ঘর ফিরত যখন হেসে-খেলে;

মনে হত ঢেউয়ের জ্বলে ফুলটিরে কে গেছে ফেলে!

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও পথ দিয়ে চলতে ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসটিরে।
দোষ কি তাহার? ওই মেয়েটি মিছেমিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল! অমন রূপে কেমনে রাকে পরাণটা সে!
এ পথ দিয়ে চলতে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আচঁলে তার দে সে ভরে।
মাঠের হেলের নাস্তা নিতে হুকোর আগুন নিবে যে যায়,
পথ ভুলে কি যায় সে নিতে, ওই মেয়েটি রানছে যেথায়?
নিড়ের ক্ষেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি,
ভর-দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ি!
ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটির বাশীটিরে,
ওদের গরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় সে ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যাথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সুখের মুখর কথা!

এমনি করে দিনে দিনে লোক- লোচনের আড়াল দিয়া,
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া!
সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চলত যখন গাঙের ঘাটে
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগত ভারি ওদের বাটে।

মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস,
ওই মেয়েটির জল-ভরনে ভাসতে ঢেউয়ে রূপের উছাস।
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বলত যেন মনে মনে,
জল ভর লো সোনার মেয়ে! হবে আমার বিয়ের কনে?
কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা!

বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের,
সোনা লতায় গড়ব বালা তোমার দুখান সোনা হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্র বেঁধে কুটিরখানি,
মেঝের তাহার ছড়িয়ে দেব সরষে ফুলের পাঁপড়ি আনি।
কাজলতলার হাটে গিয়ে আনব কিনে পাটের শাড়ী,
ওগো বালা! গাঁয়ের বালা! যাবে তুমি আমার বাড়ি?”

এই রুপেতে কত কথাই আসত তাহার ছোট্র মনে,
ওই মেয়েটি কলসী ভরে ফিরত ঘরে ততক্ষণে।
রুপের ভার আর বইতে নারে কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে,
কোনোরুপে চলছে ধীরে মাটির ঘড়া জড়িয়ে ধরে।
রাখাল ভাবে, কলসখানি না থাকলে তার সরু কাঁখে,
রুপের ভারেই হয়ত বালা পড়ত ভেঙে পথের বাঁকে।
গাঙোন জল ছল-ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে,

কলস ঘিরি উঠছে দুলি' গেঁয়ো-বালার রুপের টানে।

মনে মনে রাখাল ভাবে, "গাঁয়ের মেয়ে! সোনার মেয়ে।
তোমার কালো কেশের মত রাতের আঁধার এল ছেয়ে।
তুমি যদি বল আমায়, এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি
কলাপাতার আঁধার-ঘেরা ওই যে ছোট তোমার বাড়ি।
রাঙা দু'খান পা ফেলে যাও এই যে তুমি কঠিন পথে,
পথের কাঁটা কত কিছু ফুটতে পারে কোনমতে।
এই যে বাতাস-উতল বাতাস, উড়িয়ে নিলে বুকের বসন,
কতখন আর রুপের লহর তোমার মাঝে রইবে গোপন।
যদি তোমার পায়ের খাড়ু যায় বা খুলে পথের মাঝে,
অমর রুপের মোহন গানে সাঁঝের আকাশ সাজবে না যে।

আহা ! আহা ! সোনার মেয়ে ! একা একা পথে চল,
ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।"
এমনিতর কত কথায় সাঁঝের আকাশ হত রাঙা,
কখন হলুদ, আধ-হলুদ, আধ-আবীর মেঘ ভাঙা।
তার পরেতে আসত আঁধার ধানের ক্ষেতে, বনের বুকে,
ঘাসের বোঝা মাথায় লয়ে ফিরত রাখাল ঘরের মুখে।

সেদিন রাখাল শুনল, পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে,

আসবে কালি 'নওশা'তাহার ফুল-পাগড়ী মাথায় দিয়ে।
আজকে তাহার 'হলদি-ফোটা' বিয়ের গানে ভরা বাড়ি,
মেয়ে-গলার করুণ গানে কে দেয় তাহার পরাণ ফাড়ি'।
সারা গায়ে হলুদ মেখে সেই মেয়েটি করছিল সান,
কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা'খানা।
চেয়ে তাহার মুখের পানে রাখাল ছেলের বুক ভেঙে যায়।
আহা ! আহা ! সোনার মেয়ে ! কেমন করে ভুললে আমায় ?

সারা বাড়ি খুশীর তুফান-কেউ ভাবে না তাহার লাগি,
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মকর্দ্দমার দাগী।
অপরাধীর মতন সে যে পালিয়ে এল আপন ঘরে,
সারাটা রাত মরল ঝুরে কি ব্যথা সে বক্ষে ধরে।

বিয়ের ক'নে ছলছে আজি শ্বশুর-বাড়ি পালকী চড়ে
চলছে সাথে গাঁয়ের মোড়ল বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধ'রে ।
সারাটা দিন বিয়ে বাড়ির ছিল যত কল-কোলাহল
গাঁয়ের পথে মূর্ত্তি ধরে তারাই যেন চলছে সকল।

কেউ বলিছে, মেয়ের বাপে খাওয়াল আজ কেমন কেমন,
ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছে কি ভাই তেমন তেমন?
মেয়ে-জামাই মিলছে যেন চাঁদে চাঁদে মেলা,

সুর্য যেমন বইছে পাটে ফাগ-ছড়ান সাঁঝের বেলা!
এমনি করে কত কথাই কত জনের মনে আসে,
আশ্বিনেতে যেমনি তর পানার বহর গাঙে ভাসে।
হায়রে আজি এই আনন্দ, যাবে লয়ে এই যে হাসি,
দেখল না কেউ সেই মেয়েটির চোখদুটি যায় ব্যথায় ভাসি।
খুঁজল না কেউ গাঁয়ের রাখাল একলা কাঁদে কাহার লাগি
বিজন রাতের প্রহর থাকে তাহার সাথে ব্যথায় জাগি।

সেই মেয়েটির চলা-পথে সেই মেয়েটির গাঙের ঘাটে
একলা রাখাল বাজায় বাঁশী ব্যথার ভরা গাঁয়ের বাটে।
গভীর রাতে ভাটীর সুরে বাঁশী তাহার ফেরে উদাস
তারি সাথে কেঁপে কেঁপে কাঁদে রাতের কালো বাতাস।
করুণ করুণ-অতি করুণ বুকখানি তার উতল করে,
ফেরে বাঁশীর সুরটি ধীরে ধীরে ঘুমো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।

"কোথায় জাগো বিরহিণী ! ত্যজি বিরল কুটিরখানি,
বাঁশীর ভরে এস এস ব্যথায় ব্যথায় পরাণ হানি।
শোন শোন দশা আমার, গহন রাতের গলা ধরি'
তোমার তরে ও নিদয়া, একা একা কেঁদে মরি।
এই যে জমাট রাতের আঁধার, আমার বাঁশী কাটি তারে,
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কেঁদে মরে বারে বারে।"

ডাকছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে,
আঁধার দিয়ে জড়ায় তারে, হাওয়ায় দোলায় ব্যথার ভারে।